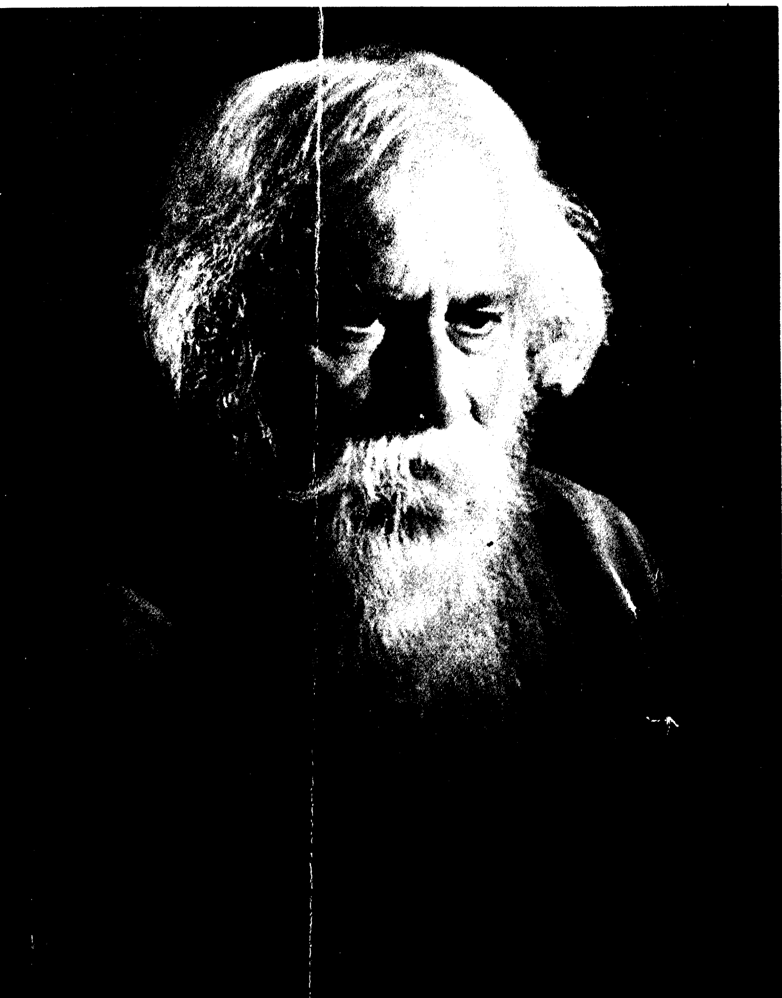
রবীন্দ্র-স্মরণে

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক

ভাইস-চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪১



বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত স্মৃতিসভায় পঠিত

সোমবার—১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১

কবি রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া, বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতকে শোক-সলিলে ভাসাইয়া আজ তিনি সসীম জগতের সকল মায়া-বন্ধন কাটাইয়া ভাষার অতীত স্থানে, কল্পনার অগম্য লোকে, অসীমে চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমাদের মর্ম্মবেদনা, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। ভাষার ভিতর দিয়া সে ব্যথা, সে শোক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব তাহা আমরা জানি না। আমরা যাহা হারাইয়াছি, দেশ যাহা হারাইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমাদের নাই; তাহা চিত্রপটে আঁকিবার তুলিকা আমরা দেখি নাই; তাই আজ আমরা যাহাই বলি না কেন, তাহাতে

আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি কণিকা-মাত্রও ব্যক্ত হইবে না। মরমের ব্যথা মরমেই থাকিয়া যাইবে, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই রহিয়া যাইবে, অশ্রুর ধারা নয়নকোণেই শুকাইয়া যাইবে।

সে আজ অনেক দিনের কথা। রাজ-রাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নূতন ঘোষণা-পত্রে তখন সবেমাত্র ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সবে নিবিয়াছে, কোম্পানীর মুলুক শেষ হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে সে এক সন্ধিক্ষণ। পলাশীর ময়দানে হতভাগ্য সিরাজের ভাগ্য-নির্ণয়ের পর এক শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই এক শত বৎসরে বাংলার সমাজে অনেক ওলট-পালট আসিয়া গিয়াছে। রাজস্ব-আদায়ের অজুহাতে একই জমির পৌনঃপুনিক ভূস্বামীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন রায়তী স্বত্ব ধ্বংস-প্রায়; দলিলী প্রমাণ অভাবে বহু লাখিরাজ, নিষ্কর

জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। মহাজন দেনদারের সর্ব্বস্ব-শোষণের সুযোগ পাইয়া আদালতের সাহায্যে পুঞ্জীভূত চক্রবৃদ্ধি সুদের দাবী বজায় রাখিতেছেন; গ্রামের শাসন, সমাজ-বন্ধন, লোক-মত এবং জন-শক্তি শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়াছে। রেলওয়ের লৌহপাতে ভারতভূমি বাঁধা আরম্ভ হইয়াছে; প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য সীমান্ত পর্য্যন্ত, অগম্য গিরি-শিখর হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের স্তম্ভ বসিয়া যাইতেছে। সেকালের শেষ হইয়া একাল আরম্ভ হইয়াছে।

ভারত ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, ১৮৬১ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম। "কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলতো তেলের প্রদীপ।" [১]

১ রবীন্দ্র রচনাবলী—অবতরণিকা

সে সে-কালের কথা। এই আশি বৎসর ভারতের ইতিহাস বহু ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়া নানা অদল-বদল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সে-কালের মানুষ, এ-কাল দেখিয়াছেন। সে-কাল এ-কাল, দু'কালই অনুধাবন, পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করিয়াছেন, দু'এরই স্বরূপ দেখাইয়াছেন, অনুভূতি করিয়াছেন; জাতিকে দেশকে জাগাইয়াছেন; কাব্য, গীতি, গদ্যে বহু ছবি আঁকিয়াছেন; দেশ-প্রাণের স্ফুরণ, জাতির বেদনা লেখনীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রেরণার ঝঙ্কারে জন-গণ মাতাইয়াছেন; দেশের সত্য ও প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কবি হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, গাহিয়াছেন; কল্পনার ছবিতে বাস্তবতার রঙ ফলাইয়াছেন। সত্যকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন; বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি শুনাইয়া আবার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণতি দেখাইয়াছেন। জাতির, দেশের, সমাজের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। যদি কোন নৈসর্গিক

বিপর্য্যয়ে গত আশি বৎসরের ইতিহাসের নিদর্শন ও উপকরণ একেবারে লোপ পায়, তাহা হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে সে ইতিহাসের ধারা ও প্রকৃতি পুনর্গঠন করা বহু কষ্টসাধ্য হইবে না।

রবীন্দ্র-প্রতিভা আজ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত। সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজ-নীতিজ্ঞ, নানা দিক্ হইতে নিজ নিজ ভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন। পল্লীর প্রান্তরে, নদীর সৈকতে, সমুদ্রের বেলাভূমিতে, বিজন কাননে, লোকাকীর্ণ জনপদে, ঘাটে, মাঠে, বিপণিতে রবীন্দ্রনাথ আজ পরিব্যাপ্ত। শিশু, প্রৌঢ়, যুবক, বৃদ্ধ, দীন, দরিদ্র, ভিখারী, রাজা সকলেই তাহাতে আনন্দ ও অনুভূতি পাইয়াছেন। সকলেরই প্রাণের কথা, হৃদয়ের বেদনা, মর্ম্মের বাণী, অন্তরের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

জগৎ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়াছে।

"চারিদিকে নানা শব্দময় জন-কোলাহলের" মাঝে কবি-হৃদয়ের প্রথম স্পন্দন। প্রভাতের রবির কিরণে প্রাণের প্রথম স্ফুরণেই কবি দেখিয়াছিলেন,—

"চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।" [১]

কিন্তু জাগ্রত প্রাণ আর আঁধারের বাধা, পাষাণ কারাগার মানিতে প্রস্তুত নয়, সে তখন রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া পরাণ ঢালিয়া দিতে চায়; জগৎ প্লাবিয়া আকুল পাগলপারা হইয়া গাহিয়া বেড়াইতে চায়—

"অগাধ বাসনা, অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই" [২]

১-২ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সেই অসীম আশায়—

"পাষাণ বাঁধন টুটি'
ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি,
ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা" [১]

সারা প্রাণ ঢালিয়া দিতে চায়। সীমান্তবিহীন অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে প্রাণের আবেগে ছুটিতে চায়। সে তখন সংগ্রাম-প্রয়াসী—

"ফিরে নেব রবিশশিতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন" [২]

১ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ২ সংগ্রাম-সঙ্গীত

সে চায়—

"সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ" [১]

সে তখন সীমা লঙ্ঘন করিয়া, গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, পাষাণ কারা ভাঙিতে চায়—

"আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া
বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।" [২]

প্রাণে ভয় নাই, পরাজয় জানিতে চাহে না—

"মাতিয়া যখন উঠিছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ
উথলি' যখন উঠিছে বাসনা
জগতে কিসের ডর।" [৩]

১-৩ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সঙ্গে সঙ্গে—

"ভাঙ্‌রে হৃদয়   ভাঙ্‌রে বাঁধন
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্;"[১]

"ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা,
আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি
এনেছে রবির কর্।"[২]

জীবনের এই উদ্দাম আশা আজ শতমুখী হইয়া জাতিকে মাতাইয়াছে। কোথায় ইহার শেষ হইবে কেহই তাহা জানে না, বলিতে পারে না।

১-২ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

এ কথা সত্য যে—

"পূরব আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।" [১]

কিন্তু তাহার সীমা কোথায় কেহ জানে না।

"জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত জীবন মহাদেশ,
কে জানে হবে কি তাহা শেষ।" [২]

সে তখন—

"যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সে প্রাণ পেয়েছে নূতন।" [৩]

কোথায় ভবিষ্যতের পরিণতি তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। হয়তো—

"ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহলে," [৪]
"সৃজনের ধ্বংস যুগান্তরে" [৫]

১-২ অনন্ত জীবন ৩-৫ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

"আকাশের অনন্ত হৃদয়—
অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময়" [১]

হইতে পারে; হয়তো মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া মহানলের সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু—

"সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।" [২]

কবি জাতির সম্মুখে সেই আদর্শই বরণ করিলেন। ঊষার অরুণ আলোকে অসীম কালস্রোতে ভাসিয়া, কাণ পাতিয়া জগৎ-কলরব শুনিবার পথে অগ্রসর হইলেন। পথে বহু বাধা-বিপত্তি আছে, কিন্তু তাহাতেই বাঁচিয়া থাকার আনন্দ, তাহাতেই প্রাণের স্ফুরণ, তাহাতেই জীবন।

১-২ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

কেন না—

"জগৎ হয়ে রব আমি
একেলা রইব না,
মরিয়া যাইব একা হলে
একটী জলকণা।" [১]

কবি মরণের পথে যাইতে চাহেন না। যে পথে যাইতে চান, সে পথের লক্ষ্য—

"আমার নাহি সুখ-দুখ
পরের পানে চাই
যাহার পানে চেয়ে দেখি
তাহাই হ'য়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে,
আমিও যাই ভেসে,
তাদের গান আমার গান,
যেতেছি এক দেশে।" [২]

১-২ স্রোত

"চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারিয়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়।" [১]

সেই প্রভাত-কিরণের অরুণ আভায় কবি প্রথমেই দেখিলেন—দেশের বাস্তব চিত্র।

"চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে" [২]
"নীল আকাশেতে নারিকেল তরু—
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে,
প্রভাত আলোতে কুঁড়ে ঘরগুলি
জলে ঢেউগুলি ওঠে পড়ে" [৩]

১ সাধ ২ একাকিনী ৩ গ্রামে

বাংলার পল্লীতে বাঙ্গালীর প্রাণ দেখিলেন, কাহিনীতে ঘেরা ছোটো গ্রামখানিতে—

"কেহবা দোলায়, কেহবা দোলে,
গাছতলে মিলে করে খেলা,
বাঁশি হাতে নিয়ে রাখাল বালক
কেহ নাচে গায়, করে খেলা।"[১]

কিন্তু—

"চারিদিকে তার গাছের ছায়া,
চারিদিকে তার নিষুতি,
চারিদিকে তার ঝোপে-ঝাপে
আঁধার দিয়ে ঢেকেছে।"[২]

"যে প্রাণ আছিল তোরি
তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিণী বেশে"[৩]

"শূন্য গৃহ জনহীন প'ড়ে আছে কতদিন
আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে"[৪]

১ গ্রামে ২ আদরিণী ৩-৪ স্মৃতি-প্রতিমা

"চারিদিকে কেহ নাই, একা ভাঙাবাড়ি
সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে রয়েছে,
যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাক।
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া,
শুষ্ক শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
হেলিয়া ভিত্তির পরে রয়েছে পড়িয়া।" [১]

তার পরের অবস্থায় "উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগলো" [২] তখন গ্রামের মধ্যে গিয়া দেখিলেন—

"এক কালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোট হয়ে গেছে" [৩]

১ পোড়ো বাড়ি

২ প্রকৃতির প্রতিশোধ—মন্তব্য

৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ

"চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর" [১]
দেখিলেন গ্রামবাসী পরস্পর ঝগড়া-দ্বন্দ্বে মগ্ন। "পরের ভিটামাটি উচ্ছন্ন করিতে এক গালে চূণ, এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে, ভিটেয় ঘুঘু চরাতে" মশ্‌গুল; পণ্ডিত তখন "স্থূল থেকে সূক্ষ্ম," কি "সূক্ষ্ম থেকে স্থূল," "বৃক্ষ থেকে বীজ" কি "বীজ থেকে বৃক্ষ" ইহার মীমাংসা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত; "শাস্ত্র নাহি যার শাস্ত্রের উপদ্রব চতুর্গুণ"। অন্নের কাঙাল বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে, আর প্রহরী আসিয়া ভিখারীকে ধাক্কা দিয়া মন্ত্রীর পুত্রের পথ পরিষ্কার করিতেছে। অন্য দিকে "ক্রন্দনের ধ্বনি," "শুধু ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা," "ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা," "ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা তবু প্রজা কাঁদে অনাহারে," "দিগ্বিদিকে হাহাকার," "উর্দ্ধস্বরে কেঁদে মরে, রাজ্য উৎপীড়িত নিতান্ত প্রাণের দায়ে"

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ

কবি তাই কাঁদিতেছেন—

"কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন ?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল ? কেন মানুষের 'পরে
মানুষের এত উপদ্রব ? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু তার 'পরে
সবলের শ্যেন দৃষ্টি কেন ?" [১]

এই "নিষ্ঠুর কঠিনে"র মধ্যে—

"লৌহ পঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিঃশ্বাস,
তবে কিরে আর কিছু নাহিকো উপায় ? [২]

অথচ—

"এ জগৎ মিথ্যা নয়,
বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হ'য়ে প্রকাশিছে
আমাদের চোখে" [৩]

১ রাজা ও রাণী ২-৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ

উপায় কি ?

"কোথা যাব, কোথা যাব, শেষ অন্ধকারে
জগতের কোন্ প্রান্তে নিশীথের বুকে"[১]

শেষে কবি বলিতেছেন :—

"ভালবেসে চাহিব—
এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাবো
স্বরূপ ইহার।"

এইরূপে কবিচিত্তের প্রথম স্ফুরণ, কবি-হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, কাব্য-জীবনের প্রথম ঝঙ্কার।

প্রভাতে অরুণ উদয়ের প্রথম আলোকস্পর্শে কবি এই দীক্ষা লইয়া ও জীবনের সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ লইয়া জগৎ-সমাজে নামিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাব্য-হিসাবে কত বড়, তাঁহার রচনা সাহিত্য-হিসাবে কোন্ স্থান

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ

পাইতে পারে, তাঁহার গানের অর্থ ও ওজন কোথায়, এ সবের মীমাংসা বা বিচারের সামর্থ্য আমার নাই। তবে তাহা না করিয়াও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে স্থষ্টি করিয়াছেন, অসীমের সীমা আঁকিয়াছেন, ভাষায় ভাবে নানা রঙের ছবি আঁকিয়াছেন, মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি পরতে পরতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, রচনা ও গানে romanticism, mysticism, রূপ-মাধুর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা, রসলীলায় বৈচিত্র্য কি আছে, তাহার আলোচনা আজ করিব না। কবি-চিত্তের শুধু একটী দিক্ আজ দেখিতে চাই,—কবির স্বদেশ-সাধনা, দেশপ্রীতি এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূতি ও গভীর অনুরাগ।

কবির দেশবোধ abstract অনুভূতি বা মানস-কল্পনা নহে। দেশ তাঁহার কাছে পরম সত্য ও সজীব। তিনি নানা ছন্দে ও সুরে, শত রঙের

চিত্রে ও মানচিত্রে, অপরূপ রূপে দেশ মূর্ত্ত করিয়াছেন, যুগ-যুগান্তরের কাহিনী লিখিয়াছেন, জাতীয় জীবনের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও অতীতের ইতিহাস চলচ্চিত্রের মত দেখাইয়াছেন, এই দেশাত্মবোধে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা নাই। সমাজের সহিত তাঁহার নিকট সম্বন্ধ—

" জগৎ জুড়িয়া এক জাতি সবে,
সে জাতির নাম মানব জাতি "

এই আদর্শ সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সে আজ বহু দিনের কথা নয়, যে দিন ভারত প্রাণহীন, নিস্পন্দ, নীরব, নির্জীব বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। অথচ বিশ্ব-জগৎ তখন নব অভ্যুদয়ে জাগরিত, মুখরিত। সেই দুর্দ্দিনে কবি গাহিয়াছিলেন—

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,

বেঁচে ম'রে কী বা ফল, ভাই।

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।"

সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট্ অগ্রসরের পথে আহ্বান করিয়া কবি বলিয়াছিলেন—

"পিছায়ে যে আছে তা'রে ডেকে নাও,

নিয়ে যাও সাথে ক'রে

কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও

মহত্ত্বের পথ ধ'রে।"

পরমলক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সাহস করিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন—

"দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি'

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,

প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি'

নির্ভয়ে আজি গাহো রে।"

সোনার ভারতের মানচিত্রের স্বরূপ দেশের মর্ম্মপটে আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন—

"নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

দেশ নববলে বলীয়ান্, নূতন আদর্শে মহীয়ান্ হইয়া উঠুক, ইহাই কবির ছিল পরম বাঞ্ছিত। কেন-না—

"সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে,
ভ্রমিছ দীন প্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শতশত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে।"

তাই অগ্নিবীণায় সেই ছবি মূর্ত্ত করিয়া কবি বলিয়াছিলেন—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,

তোমারি মন্ত্র অগ্নি বচন

তাই আমাদের দিয়ো।

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব

তোমার উত্তরীয়।"

তার পর এমন এক দিন আসিয়াছিল, যে দিন সারা বাংলা দেশ কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে দিন কবি গাহিয়াছিলেন—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে

ঘ্রাণে পাগল করে

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে

কী দেখেছি মধুর হাসি॥"

কিন্তু সেই পরম বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ সাধনার পথে জাতি

যাহাতে উদ্বেলিত লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, তাই সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আমার স্বদেশ, আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ।...যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টক-সঙ্কুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না ফিরিয়ো না, দুর্য্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ-সমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অতি বিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে

আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে।" [১]

তাই নানা ভাবে কবি বলিয়াছেন—

"আমি ভয় করবো না,
ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে
মরবো না ভাই মরবো না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরবো না।"

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়তো রে ফল ফলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

১ বিজয়া-সম্মিলন

"বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে
অমনি কি তুই আসবি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।"
"যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলো রে।"

এই আদর্শের বৈচিত্র্য-প্রকাশের মধ্যে কবি দেশ-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল;

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক।”

“কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদবো নয়ন শেষে।”

দেশের এই পরম কান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি দেশের স্বরূপ উন্মোচিত করিয়া বলিয়াছেন—

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর

আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।”[১]

“পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে। আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী সে দান করিবে, যে গৃহী সে আতিথ্য করিবে, যে জ্ঞানী সে অধ্যাপনা করিবে, যে জ্যেষ্ঠ সে পালন করিবে, যে কনিষ্ঠ সে সেবা করিবে। ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা

১ ভারতবর্ষের ইতিহাস

মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায় তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ, অতিথি যদি ফিরিয়া যায় তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষেই শুভ।" [১]

এই কল্পনায় কবির কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা নাই। বিরাট্ হৃদয়েই তিনি বিরাট্ কল্পনা করিয়াছেন। শত শত মানুষের ধারা আসিয়া এই ভারতের সৃষ্টি। পুঞ্জীভূত ভাবের সমাবেশে ভারত-সভ্যতা স্থাপিত—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হতে
সমুদ্রে হোলো হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

১ বারোয়ারি-মঙ্গল

ইহাই ভারতের স্বরূপ।

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
তুমি চির সারথি তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
শঙ্কট দুঃখত্রাতা।
জন-গণ-পথ-পরিচায়ক জয়হে ভারত-
ভাগ্যবিধাতা।"

এই বিরাট্ মহামানবতার উপর ভারতের বিরাট্ ভবিষ্যৎ নিহিত। শুধু নিজেরাই যেন নিজেদের শত্রুতা না করি,—

"ঝড় তুফানে ঢেউয়ের মারে
তবু তরী বাঁচ্‌তে পারে
সবার বড়ো মার যে তোমার
ছিদ্রটার ঐ মার খানা।"

এই বিরাট্ কল্পনায় কবি বলিয়াছেন,—

"উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গ-মুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্ব্ব-সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম-প্রান্ত পর্য্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্ম-পুত্রের কূল উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাঙ্গালাদেশের সমস্ত ছায়া-তরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র

ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের গীতিধ্বনি”[১] “একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক।”[২]

আজ আমরা যেন সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হই, ইহাই আমাদের কামনা।

জীবনের প্রারম্ভে কবি গাহিয়াছিলেন—

“যেথায় পুরানো গান
যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে
রেখে দিস গানগুলি
রচে দিস সমাধি, শয়ন।”[৩]

আজ তাঁহার চির সমাধির পর রবীন্দ্রনাথের বাণী বাঙ্গালীর মরমে পরতে পরতে আঁকা আছে। রবীন্দ্রনাথ মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মরেন

১-২ বিজয়া-সম্মিলন ৩ সন্ধ্যা

নাই। কালিদাস, বাল্মীকি, কীর্ত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, সেক্স্পীয়র, মিল্টন, ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, ইকবাল যেমন সঞ্জীবিত, সত্য, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ বাংলা সাহিত্যে, বিশ্ব-সাহিত্যে অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবেন।

তবু আজ তাঁহার স্মৃতিদিনে শুধু মনে হইতেছে, কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছি। আর তাঁহাকে আমাদের এত নিকটে পাইব না। মর জগতের সকল মায়ার বাঁধন কাটিয়া তিনি আজ অমরলোকে বিরাজমান। কেমন করিয়া তাঁহার মর-স্মৃতি জাতির মধ্যে দেশের মধ্যে জাগাইয়া রাখিব, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। শোকসন্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়—আমরা এখনও শোকাচ্ছন্ন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই কথা বলিতে চাই যে, যাহাতে তাঁহার স্মৃতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বদা অভিনন্দিত থাকে, তাহার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শীঘ্র একটী মীমাংসা করিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে এই কথা আজ আপনাদিগকে জানাইতে

চাই। কিন্তু আমরা যাহাই করি না কেন, বাঙ্গালী যেন একথা ভুলিয়া না যায়, কবির বিশিষ্ট সৃষ্টি বিশ্বভারতী, সেই বিশ্বভারতী যেন আমাদের দেশে বাঁচিয়া থাকে, নতুবা বাঙ্গালীর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমি এই প্রস্তাব আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাই—"কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আজ সমগ্র বাংলা দেশ শোকসন্তপ্ত। অর্দ্ধ-শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল কবি বাঙালীকে, ভারতবাসীকে, জগৎকে নানা দিক্ দিয়া যে দান করিয়াছেন, তাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানব-হৃদয়কে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিবে। আজ তিনি মরজগতের সকল বন্ধন কাটিয়া অমরলোকে বিরাজমান। এই স্মৃতিদিনে আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও বিশ্ব-ভারতীর সকলকেই আমাদের অন্তরতম সমবেদনা জানাইতেছি।"
